PARTHASARATHI :: RNI 5158/ 60 :: 1st e- magazine published on 24.04.2020 during Nationwide Lockdown

তৃতীয় অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই আষাঢ়, ১৪২৭ / ২৪ শে জুন, ২০২০

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
ভারতের প্রাণ	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
তুমি তো রয়েছ সাথে	স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ
পয়লা মে - ২০২০	প্রকাশ অধিকারী
অভীপ্সা	শ্রীলা মৈত্র
স্ববিরোধ	সুনন্দন ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দের দর্শন	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
ধর্মাচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রী সুধীর কুমার মিত্র

DO NOT COPY

ভারতের প্রাণ

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হয় অধর্মের অভ্যুত্থান, তখন তখনই তিনি নিজেকে সৃজন করেন, অব্যক্ত তিনি ব্যক্তিরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ আমরা অধিকাংশ দেশবাসী বিষ খেতে ভালবাসছি, অমৃত ত্যাগ করে মরণের পথে, ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছি। কোথায় চলেছি তা' আমরা জানিনা, বুঝিনা। পরানুকরণপ্রিয়তাই এখন আমাদের নিলয়ের পথে, নিরয়ের পথে নিয়ে চলেছে।

আজ আমরা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি তাঁর জন্য।

তিনি আসবেনই। আসতে তাঁকে হবেই। কিন্তু কিভাবে, কোন মূর্তিতে – তা' আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি আসবেনই। তিনি যে জগতের ত্রাণকর্তা। ভারতের প্রাণ।

পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

আমার স্বামী শ্রীপ্রীতিকুমার ৩২ বছরের দীর্ঘ পরিসরে আমাকে যে অসংখ্য চিঠি লিখে গেছেন, তার সবগুলি সংরক্ষণ করতে না পারলেও, যা আমার কাছে আছে তার অল্প কয়েকটি প্রকাশ করলে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি সকলের কাছে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। ১৯৬৬ সালে Basic Mountaineering Training নেবার জন্য আমি মানালীর Western Himalayan Mountaineering Institute-এ গেছিলাম মে জুন মাসে। ঐ সময়ে যে চিঠিগুলি তিনি আমার জন্য লেখেন, সেগুলি পড়লে বোঝা যাবে কি প্রগাঢ় মমত্ববোধ ছিল তাঁর, কি আন্তরিক অনুপ্রেরণা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন যা ভবিষ্যৎ জীবনে আমাকে পর্বতারোহণে আগ্রহী করেছিলো। আমার নিরাপত্তার জন্য তাঁর চিন্তা তাঁর উদ্বেগ কত সহজেই না তিনি প্রকাশ করেছিলেন! এই রকম দু তিনটি চিঠি এই সংখ্যার পার্থসারথিতে পাঠকবর্গের কাছে প্রকাশ করছি।

*****

৭/২১, বরদা বসাক ষ্ট্রীট,
বরানগর, কলিকাতা-৩৬
২৯শে মে, ১৯৬৬
রাত্রি ৯টা

অভিন্নহৃদয়েষু,

চিন্তা ছাড়ছে না যতক্ষণ না তোমার পৌঁছসংবাদ পাচ্ছি। পৌঁছে সংবাদ দেবে। ওখানকার সব অবস্থা ও ব্যবস্থা জানিয়ে চিঠি দেবে। ট্রেনে কিভাবে কাটালে জানাবে। মন খুবই চঞ্চল আছে, সব অবস্থায় সাবধানে থাকবে। বাবু বারবার ১ ঘন্টা বাদবাদ তোমার কথা

DO NOT COPY

জিজ্ঞাসা করে। কোথায় কোন স্টেশনে তুমি এখন গিয়েছো। মনে একটু কষ্ট আছে মনে হয়। গল্পের বইয়ের নেশায় আছেন। ----

আর সব নিয়মিত চলছে। আমি কাল আর শ্যামবাজার যাই নি। আজ কিছু সময়ের জন্য গিয়েছিলাম। চিঠি দিও। আদর জানিও।

ইতি

তোমার প্রীতিকুমার

*****

Calcutta-36

2nd June, 1966

অভিন্নহৃদয়েষু,

চিঠি পেলাম ধানবাদ ও পাঠানকোট থেকে লেখা। যে চিন্তা নানাভাবে পীড়ন করছিল তা' থেকে তোমার চিঠি পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। অনেক দূরের রাস্তা। নানা জাতি, নানা লোক, নানা মনোভাব। তাই ভাবনা বেশি ছিল। জানি ঁমা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছেন। আছেন তোমাকে ঘিরে। তবু মানুষের মন মানতে চায় না। তোমার চিন্তা করার কিছু নেই। ভয় ভাবনা ত্যাগ করে ঝাঁপ দাও, জয় হবেই। দেখবে তুমি সব চাইতে ভাল ফল লাভ করেছ। বৃথা ভাবনা করে মন ও দেহকে দুর্বল করোনা। দেহ ও মনকে ধারালো তরবারির মত রাখবে। ভয়কে দূরে সরিয়ে দাও। মৃত্যু ও বিপদ কে যে তুচ্ছ করতে পারে, সে স্বর্গরাজ্য জয় করতে পারে। নিজেকে সতর্ক রাখতে হয়। বুদ্ধিকে প্রখর রাখতে হয়। দৃষ্টি সজাগ রাখতে হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে মনোবল রেখে এগিয়ে চলো। মনে রেখো দূর থেকে যাকে ভয় ও শঙ্কা মনে হয়, নিকটে তা অতি সহজ ও সরল হয়। আমি পর্বতচূড়ায় উঠলাম - আমার দিব্য প্রেম ও মনঃসংযোগ সেখানে পৌঁছে দিলো। যে অজানা আগে আমাকে চঞ্চল করে রেখেছিল তা অতি সহজ ও মধুর হয়ে উঠেছে। এখন এই দিব্যপ্রেম প্রতিনিয়ত তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক দিব্য অনুভূতি ও আনন্দময় রাজ্যে নিজেকে রেখে দিয়েছে।

আমার ভিতরের চৈত্য সত্বা এখন তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে এক মধুর রাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। জানি এ স্পর্শ ও অনুভূতি তোমাকে সদা সর্বদা অন্য এক আনন্দ রাজ্যে রেখে তোমার সকল ভাবনা চিন্তা ও ব্যথার অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে।

তোমার বাপি এবার তোমার জন্য একটু চিন্তা করছে মনে হয়। ভালই আছে। টাকা দরকার হলে লিখবে বা টেলিগ্রাম করবে। যদি সম্ভব হয় কাশ্মীর দেখে এসো।

আদর নিও।

ইতি

তোমার প্রীতিকুমার

*****

4th June, 1966

অভিন্নহৃদয়েষু,

পাঠানকোট থেকে ফিরে এক ভদ্রলোক তোমার সংবাদ দিয়েছিলেন ফোনে। বাবু আজ মামাবাড়ি গেছে। কাল ওকে নিয়ে আসবো। ওখানে থাকতে চায় না আমার অসুবিধে হবে ব'লে। বলছিল- "তোমাকে সকালে কে চা বানিয়ে দেবে? এটা ওটা করে দেবে?" - ও ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে আমার চা করে দেয়। স্নান করে খাবো বলে আরো দু কাপ করে রেখে দেয়। খুবই সেবা করছে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না। নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করছে।

তোমার মানালীর পৌঁছ সংবাদ পাইনি। হয়ত সোমবার পর্যন্ত পাব। -----

বাবুর খোঁজ খবর বিশেষ কেউ নিচ্ছে না। এ সংসারে যার জন্য যত করতে পারবে ততই ভাল। উপকার আশা করা অপরাধ। তোমার

DO NOT COPY

বাবু ভালই আছে। ভাবনা করো না, তোমার পৌঁছ সংবাদ, ওখানকার কাজের ধরণ ও তোমার শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে খবর পেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারব। সমস্ত কাজ ধীরে সুস্থে ও ধীর মস্তিষ্কে করবে। হড়বড় করে কিছু করবে না। সব চাইতে উঁচুতে যখন উঠবে মন ও প্রাণের অবস্থা কেমন হয়, হৃদয়ে কি অনুভূতি আসে সব লিখে রাখবে ডাইরীতে।

পাঠানকোটের পর আর চিঠি পাইনি। আদর জানবে। সব অবস্থায় সাহস রাখবে।

ইতি -

তোমার প্রীতিকুমার

তুমি তো রয়েছ সাথে

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

তোমার আরতি পূজাই আমার ধ্যান
তোমার চরণ সেবাই আমার জ্ঞান।।
জগতের যে যা কিছু বলে বলুক
অজানা আবেশে যা ভাবে ভাবুক,
সেথা নাই মোর কোন অভিমান।।
চায় না মন লোক দেখান সাধনা,
তুমি তো অন্তর্যামী জানো মোর প্রার্থনা।
জীবনের সকল সাধনার দুর্গম পথে
তুমি অগোচরে সদা রয়েছো তো সাথে।
আমার যা কিছু সব তোমারি তো দান।।

পয়লা মে - ২০২০

প্রকাশ অধিকারী

করোনা বিরোধী যুদ্ধ শেষে
আমরা ক'জন বেঁচে থাকবো
জানি না।
জানি না, এই যুদ্ধ কেন
দেশে দেশে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রূপে
লকডাউন হয়ে
গৃহ-যুদ্ধের রূপ নিয়ে নিল!
তবু জানি -
মৃত্যু-সাগর পেরিয়ে অচিরেই
মানুষই ওড়াবে বিজয়-কেতন
শোনাবে মুক্তির শান্তি-বাণী।
কেননা, সভ্যতার পিলসুজ যারা
আজও কাজ করে যায় তারা
নগরে প্রান্তরে প্রাণ বাজী রেখে
লকডাউনের বিশ্বব্যাপী গৃহযুদ্ধের দিনে -
প্রণাম তাদের।
আজ বিশ্ব শ্রমিক দিবসে
আজ বেলুড় মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠা দিবসে
নতুন ভারত বেরিয়ে আসার মাহেন্দ্রক্ষণে!

পয়লা মে; নব প্রত্যয়ে ---
নতুন দিনের নতুন আশায়, দিশায় ---

DO NOT COPY

অভীপ্সা — **শ্রীলা মৈত্র**

বন্ধন ছিঁড়ুক।
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত
ডানা মেলে
তোমার নিঃসীম নীলিমায়
উড়ুক
আমার এ মন।

রক্ত ঝরে।
সংসারের নির্মম পেষণ
নিরন্তর আত্মার দহন
শান্ত হোক
তোমার স্নিগ্ধ নীলিমায়।
তারপরে
মিশে যাক তোমার আলোকে।

স্ববিরোধ — **সুনন্দন ঘোষ**

এক অজানা অণুজীব দেউলিয়া করে দিলো অহংকারের পুঁজি।
প্রতিদিন বেড়ে যায় আক্রান্তের সংখ্যা, কুরে কুরে খায় আতঙ্ক।
প্রতিদিন নীরবে সঞ্চিত হয় ক্রোধ – মৃত্যুতে নয়, মিথ্যের বেসাতিতে।
গৃহবন্দী মানুষের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে পরজীবী দলদাস।
খিদের টানে যারা ঘরে ফিরতে চেয়েছিল,
তারা পণ্য হয়ে গেছে – প্রচারের – রাজনীতির – দুর্নীতির।
সংক্রমিতের সেবা করে ঘরে ফিরছেন জননী,
পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে অশিক্ষা, আত্মপরতা।
ধারাভি থেকে ঘরের ছেলে মালদা ফিরলে?
আশঙ্কা !!
রেল লাইনে ছিটকে গেলে শরীর ?
তাজা খবর!!!
যাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাজার মাইল উড়ে যেতে পারতাম,
সে আজ কাছে আসতে চাইলে?
কোয়ারেন্টাইন।

অবিশ্বাস!
বাঁচতে চাওয়ার স্বার্থমগ্নতায় জীবনকেই অবিশ্বাস।
হাতের ময়লা তো ধুয়ে চলেছি মাসের পর মাস;
সব ময়লাই জমা হচ্ছে বুকের মধ্যে,
ভালবাসার চারপাশে।

DO NOT COPY

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন **ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন**

(সংক্ষিপ্ত রূপরেখা) প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দর্শনে একটি প্রশান্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত গতিশীল কর্মতৎপরতার সমণ্বয় সাধন করিয়াছেন। জড় অস্তিত্বকে চিৎ-শক্তিতে এবং মানব জাতিকে দেবত্বে উত্তরণ করার তাঁহার যে মহান সঙ্কল্প তাহা উপনিষদের আদর্শবাদ ও বাস্তব যোগ দর্শন, বিশেষ করিয়া গীতার কর্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত। পাশ্চাত্যের বিবর্তনবাদ তাঁহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি একটি আধ্যাত্মিক তথা সম্যক দর্শন উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা তাঁহার অবিনশ্বর রচনা 'দিব্য জীবন'-এ বিধৃত আছে। তিনি শুধুমাত্র একজন তাত্বিক নন, তিনি একজন বাস্তববাদী চিন্তানায়ক। যে দুটি বিশেষ সমস্যার দিকে তিনি দৃষ্টি দিয়াছেন তাহা হইল : (১) কিভাবে জড়ের সঙ্গে চেতনার সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, (২) আবার কিভাবে এই পার্থিব জীবনে পরিপূর্ণ দিব্য জীবন যাপন সম্ভব।

(২)

অন্যান্য দার্শনিকদের মত শ্রী অরবিন্দকেও একের সঙ্গে বহুর, সত্তার সঙ্গে সম্ভূতির এবং বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের দ্বন্দ্ব-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকাংশ দার্শনিক একটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া অপরটিকে অবহেলা বা নাকচ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এক বা বহু, সত্তা বা সম্ভূতি, কোনোটিকেই পরিত্যাগ বা নাকচ করেন নাই; একটি প্রকল্প বা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই তাহাদের দেখিয়াছেন, যেন তাহারা একটি বাস্তব সত্তার নানা ছন্দময় রূপ। তিনি স্বীকার করেন অসীমকল্প কখনও সত্য হইতে পারেনা; তথাপি তিনি তাহাকে অবাস্তব বলিয়া অভিহিত করেন নাই, বরং পরম ব্রহ্মের অন্যতম অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে করিয়াছেন। পরমার্থ বা ব্রহ্ম একাধারে শিব ও শক্তি; জড়, জীবন ও মনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকে নানা ভাবে সৃষ্টি করেন শুধু আত্মানন্দ বা আত্মক্রীড়ার জন্য। ইহা তাঁহার লীলা।

এইভাবে শ্রীঅরবিন্দ চরম জড়বাদ এবং চরম বৈরাগ্যকে পরিহার করিয়াছেন। জড়বাদে চিৎ ও ত্যাগাদর্শের স্থান নাই। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতো তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তারও অতিরিক্ত তিনি জড় ও অধ্যাত্মের সকল প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই বিপুল বিশ্ব শুধু ঈশ্বরকে গোপনই করেনা, তাঁহাকে প্রকাশও করে।

(৩)

বাস্তবের সন্ধানে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদির বাহিরে গিয়া শুদ্ধ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তবে শুধুমাত্র যুক্তিকেই আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। যুক্তির দ্বিবিধ রূপ – মিশ্র ও বিশুদ্ধ, নির্ভরশীল ও সার্বভৌম। যুক্তি যদি ইন্দ্রিয়প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে তাহা হয় মিশ্র বা পরনির্ভর। সেক্ষেত্রে ঐ যুক্তি আমাদের বাহ্য জগত সম্পর্কে অবহিত ও উপযোগী প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে সাহায্য করে। কিন্তু বিশুদ্ধ বা সার্বভৌম যুক্তি ইন্দ্রিয়প্রভাবিত নয়। তথাপি উহা উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারেনা। আমাদের এমনই জ্ঞানের প্রয়োজন যাহাতে বাস্তবকে সর্বাংশে গ্রহণ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দের কথায় – বোধি (intuition) সব কিছুকেই প্রত্যক্ষ করে – ইহার প্রবণতাই হইল জ্ঞান সমন্বয় ও ঐক্যের দিকে। শ্রীঅরবিন্দ ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করিয়া বোধির দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

DO NOT COPY

যুক্তি বুদ্ধি যেমন ধীরে ধীরে বোধির দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি দর্শনও মিস্‌টিসিজমে পূর্ণতা লাভ করে। তাই দর্শন ও মিস্‌টিসিজমে কোন বিরোধ নেই।

কিন্তু বোধি-বোধনের ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতা কতটুকু? শ্রীঅরবিন্দ আমাদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যুক্তিবাদী মনের চাইতেও বড় কোন শক্তির উদ্বর্তন সম্ভব।

(৪)

শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। চেতনার তিনটি রূপ – লোকোত্তীর্ণ, লৌকিক ও ব্যক্তিগত। লৌকিক অভিব্যক্তি নিগৃহন ও বিবর্তনের ফল। নিগৃহন প্রক্রিয়ায় পার্থিব চেতনাশক্তি নিজেকে সীমিত করিয়া পরিশেষে সম্পূর্ণ অচেতন বা জড়ে পরিণতি লাভ করে। বিপরীত প্রক্রিয়া বিবর্তন – এই প্রক্রিয়ায় চেতনাশক্তি ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মুক্ত বা প্রস্ফুটিত করে। নিগৃহন চিৎশক্তি বা চেতনার অবতরণ, আর বিবর্তন চেতনার উত্তরণ। বিবর্তন যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে সেগুলি হইল জড়, প্রাণ, চৈতন্য, মনস, বিজ্ঞান, আনন্দ, চিৎ ও সৎ। বিবর্তনের আগে নিগৃহন ঐ পর্যায়গুলি অতিক্রম করে ঠিক উল্টোপথে। বিবর্তনের বর্তমান স্তর পর্যন্ত জড়, জীবন ও মানসের উদ্বর্তন সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং অতিমানস বা বিজ্ঞানের উদ্বর্তন না হইবার কারণ নাই। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, “Mind, life and matter are the realized powers of the evolution and well known to us, supermind and the triune aspect of Sachchidananda are the secret principles which are not yet put in front and have still realized … and we know them only by hints…” অতিমানসের উদ্বর্তন অর্থাৎ পৃথিবীতে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা এবং পার্থিব জগতে দিব্য চেতনার বহুল অভিব্যক্তি। অতিমানস হইল সত্য-চেতনা যাহা সমস্ত বিভাগ বিভেদ বা অবিদ্যা মুক্ত।

তবে বিবর্তন যন্ত্রের মত চালিত কোন পদ্ধতি নহে, যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহাই মনে করিয়া থাকেন। ব্যাপ্তি, অবতরণ ও একীভবন – বিবর্তনের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য। নিম্নস্তর হইতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উচ্চতর স্তরের উদ্বর্তন হয় না। পরতর স্তর নিম্নতর স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উর্ধতর স্তর নিম্নতর স্তরের মধ্যে জড়িত থাকে বলিয়াই উর্ধের চাপ কার্যকরী হয়। এইভাবেই বিবর্তন ঘটে।

(৫)

অতিমানস কোন স্বপ্ন নহে। লৌকিক বিবর্তনই অতিমানস – উদ্বর্তনের দ্যোতক। যোগসাধনার ফলে ব্যক্তিমানস ধীরে ধীরে অতিমানস স্তরে পৌঁছাইতে পারে। ইহাকে ব্যক্তিগত বিবর্তন বলা যায়। ব্যক্তিগত বিবর্তনকে সামগ্রিকভাবে যোগ আখ্যায়ও অভিহিত করা চলে। আক্ষরিক অর্থে যোগ হইল মিলন। যোগের ফলে ব্যক্তিসত্তা দিব্যসত্তার সহিত মিলিত হয়, লৌকিক বিশ্বোত্তীর্ণের সহিত। ইহাকেই তিনি পূর্ণযোগ আখ্যা দিয়াছেন। যোগের সঙ্গে বিবর্তনের এই সংযোগ বা সম্পর্ক শ্রীঅরবিন্দের যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পূর্ণযোগের নীতি পদ্ধতি নির্ধারণকালে শ্রীঅরবিন্দ প্রচলিত বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়াছেন, প্রত্যেকটি পদ্ধতির নিজস্ব মূল্য আছে কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। তিনি কোনটিকেই পরিত্যাগ বা নাকচ করেন নাই। সব পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। প্রচলিত যোগ-পদ্ধতিতে উর্ধযাত্রার চেষ্টা হয়, কিন্তু পূর্ণযোগে শুধু দিব্য সত্তার সহিত মিলনের প্রয়াস নয় উর্ধচেতনাকে নিম্নে নামাইয়া আনার প্রয়াস আছে। পূর্নযোগে শ্রীঅরবিন্দ শুধুমাত্র অতিমানস স্তরে উঠিবার কথাই বলেন নাই, অতিমানসকে মনুষ্য চেতনায় স্থায়িত্বদানের কথাও বলিয়াছেন। উর্ধশক্তি

যদি মানুষের মনের ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলে তবেই তাহা সম্ভব। সে জন্য প্রয়োজন উর্ধশক্তির কাছে সম্পূর্ন আত্মসমর্পণ। পূর্ণযোগের ফলশ্রুতি হইল অতিমানস, উর্ধতম স্তরে যাহা দিব্য বিজ্ঞান, বা জ্ঞান-শক্তি-আলোক-আনন্দ। উহার দ্বারা দিব্যসত্তা বিশ্বকে চেনেন, ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করেন।

(৬)

এই বিবর্তন তত্বের আলোকে শ্রীঅরবিন্দ নূতন জগতে নূতন মনুষ্য জাতির আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। নূতন মনুষ্যজাতি অতিমানব ও নূতন জগৎ অতিপ্রকৃতি। তাই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। শ্রীঅরবিন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, "A Spiritual religion of humanity is the hope of future." তিনি আবার সবিস্তারে বলিয়াছেন, "A religion of humanity means the growing realization that there is a secret Spirit, a divine Reality in which we are all one, that humanity is its highest present vehicle on earth, that the human race and the human being are the means by which it will progressively reveal itself here."

মহাদার্শনিকের এই দর্শন ও ভবিষ্যৎ বাণী সফল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।*

---

* লেখকের মূল ইংরাজী রচনা "Sri Aurobindo's Philosophy: A brief outline" এর বঙ্গানুবাদ। শ্রী প্রণব কুমার ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

ধর্মাচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রী সুধীর কুমার মিত্র

ধর্ম-সাধনায় যে কয়জন বিদ্যুৎ-গর্ভ মহামানব স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন ধর্মাচার্য বিজয়কৃষ্ণ তাদের মধ্যে একজন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশো বছর আগে জগতের বহির্মুখিতা দেখে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করার জন্য প্রতিদিন গঙ্গাজলে তুলসী দিয়ে ভক্তিভরে যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেন, এবং যাঁর প্রেমহুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব, সেই অদ্বৈতাচার্যের বংশে উনিশ শতকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য ছিলেন ভক্তিকল্পতরুর একটি প্রধান স্কন্ধ। চৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত স্বরূপ দামোদরের মতে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন মহাবিষ্ণুর ভক্ত-অবতার। তাই বাল্যকাল থেকেই ভক্তি-প্রেম-প্রীতি তাঁর অধস্তন অন্যতম বংশধর বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিলো। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি :

অদ্ব�ৈত আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ।।
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগতাদি কার্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাত অদ্বৈত আচার্য ।।
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ।।
ইচ্ছায় অনন্তমূর্তি করেন প্রকাশে ।

DO NOT COPY

এক এক মূর্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ।।

সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাগ্রি কিছু ভেদ।

শরীর বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ ।।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দহকুল গ্রামে মাতুলালয়ে ঝুলন পূর্ণিমার দিন ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ (২ আগস্ট, ১৮৪১) বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতার নাম আনন্দকিশোর ও মাতার নাম স্বর্ণময়ী। পৈত্রিক নিবাস শান্তিপুর। সদানন্দময় আনন্দকিশোরের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মভীরুতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের জন্য সেকালে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর ছিলেন তাঁর গৃহদেবতা। তাঁর ধর্মভাব এত প্রবল ছিল যে, শ্যামসুন্দরের ভোগ রাঁধবার জন্য যে কাঠ ব্যবহৃত হত, তিনি আগে থেকে সেই সব কাঠগুলো গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখতেন। তাই স্থানীয় লোকেরা পরিহাস করে তাঁকে 'লাকড়িধোয়া গোঁসাই' বলে অভিহিত করেছিলো। তিনি গলায় সর্বসময় নারায়ণ শিলা ধারণ করে থাকতেন। ভক্তিগ্রন্থ পাঠে তাঁর একান্ত অনুরাগ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে করতে তন্ময় হয়ে প্রায় তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। শিশুকাল থেকে এই সব ভক্তিভাব দেখে বিজয়কৃষ্ণের মনে যে ভক্তিবীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠে। শান্তিপুর থেকে দণ্ডী খাটতে খাটতে সাড়ে তিনশো মাইল অতিক্রম করে পুরীতে গিয়ে আনন্দকিশোর জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন। এই রকম ধর্মানুরাগ ও দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বিরল বলা যায়। তাঁর বহু শিষ্য ছিল এবং প্রতিদিন তাঁর বাড়ি শিষ্যবর্গের কোলাহলে মুখরিত হয়ে থাকতো।

বিজয়কৃষ্ণের মাতাও ছিলেন এক পুণ্যবতী, ধর্মপ্রাণা মহীয়সী মহিলা। স্বামীর মত তিনিও নানাগুণে বিভূষিতা ছিলেন। প্রত্যহ শ্যামসুন্দরের ভোগ তিনি নিজের হাতে সুচারুভাবে রান্না করতেন এবং সেই ভোগ পরিবার বহির্ভূত চার-পাঁচজন লোককে না খাওয়ানো পর্যন্ত তিনি অভুক্তা থাকতেন। মায়ের মতন আদরযত্নের জন্য শিষ্যগনও তাঁর বাড়িতে বহুদিন ধরে বাস করে যেতেন। দরিদ্র শিষ্যদের অভাব মোচনের জন্য তিনি শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। সাধারণতঃ গুরুগিরি যারা করেন, তাঁদের উপর আমাদের অনেকেরই এরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, গুরুরা শিষ্যদের কাছ থেকে খালি দোহন করতেই আগ্রহী। তাই গুরুবাদ আমাদের সমাজ থেকে এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই গোস্বামীবংশ কিন্তু সে হিসাবে ব্যতিক্রম বলা যায়। দান ছিল এই বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই শৈশবকাল থেকেই পিতামাতার সমস্ত সদগুণ বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল দেখতে পাওয়া যায়।

ছ'মাস বয়সে বিজয়কৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হয়। আনন্দকিশোরের কুলগুরু তাঁর নামকরণ করেন। আজ তাঁর কর্মবহুল ধর্মজীবনের ঘটনাবলী দেখে বলা যায় যে, তাঁর নামকরণ সার্থক হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে শান্তিপুরের পাঠশালায় বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু তাঁর মাতৃদেবী কখনও শান্তিপুরে কখনও দহকুল গ্রামে থাকতেন বলে তাঁর শিক্ষার খুব ব্যাঘাত ঘটে। শৈশবে তিনি খুব চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন। একবার তিনি যা বলতেন, তা না করে ছাড়তেন না। কিন্তু তাঁর এই একগুঁয়েমি ও চপলতার মধ্যে কোনরকম কপটতা বা অসদবুদ্ধি ছিল না। পাঠশালার পাঠ শেষ করে তিনি শান্তিপুরে গোবিন্দ গোস্বামীর টোলে সংস্কৃত পড়ার জন্য প্রবিষ্ট হন এবং অধ্যয়নশীল ও মেধাবী ছাত্ররূপে স্বল্পকালের মধ্যে গুরুমহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্ররূপে পরিগণিত হন। বাল্যকাল থেকে তাঁর মাতার পরদুঃখকাতরতা দেখে বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ও দ্রবীভূত হতে সুরু হয়, পরে ইহা তাঁর চরিত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিলো। এ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

বাল্যাবস্থায় বিজয়কৃষ্ণের উপনয়ন ও দীক্ষা একসঙ্গে গোস্বামী বংশের কৌলিক প্রথানুসারে হয়। বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বশতঃ প্রত্যহ তিনি নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে পূজার্চনা করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। টোলের পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্তিপুরে থাকেন। তারপর আঠার বছর বয়সে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে এসে ভর্তি হন।

তিনি যে সময় কলকাতা আসেন, তখন কলকাতা বাঙ্গলা-বিহার-ওড়িষ্যা-আসামের কেন্দ্রস্থল। নূতন পাশ্চাত্য শিল্পের আলোকে শিক্ষিত বঙ্গ-যুবকগণ তখন সারা ভারতে সর্ববিষয়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত যুবকগণ সে সময়ে ধর্ম-বিশ্বাসহীন, উদ্ধত ও উন্মার্গ-গামী। বাঙ্গলাদেশে তখন এক যুগসন্ধিকাল। তখন রাণী রাসমণি ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেছেন, গিরিশচন্দ্র দেশীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন, মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাছাড়া নীলকরদের হাঙ্গামা ও তার প্রতিরোধের জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখনী ধারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাদের বিবাহ-বিষয়ক আইন, সতীদাহ নিবারণ আইন, সিপাহী বিদ্রোহে সোমপ্রকাশ পত্রিকার অভ্যুদয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবিধ ঘটনায় বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ আলোড়িত বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ। সেই সময় যুবক বিজয়কৃষ্ণ একা অভিভাবকহীন অবস্থায় অধ্যয়নের জন্য কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন এবং হাওড়ায় সাঁত্রাগাছিতে তাঁর এক পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। কলকাতার সেই যুগসন্ধিকালে বিজয়কৃষ্ণের কৌলিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধর্মনিষ্ঠা তাঁকে সেই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে অনেক দুর্নীতি থেকে রক্ষা করেছিলো। হাওড়ার পুল তখনও হয়নি; নৌকা করে গঙ্গা পার হতে হতো – তিনি সাঁত্রাগাছি থেকে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে নৌকায় নদী পার হয়ে কলেজ স্ট্রীটে সংস্কৃত কলেজে প্রত্যহ যাতায়াত করতেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করার সময় হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে এবং তিনি তখন বেদ-বেদান্ত পাঠে ব্রতী হন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ধর্মপ্রবণতা খুব প্রবল ছিল এবং ধর্ম-সংক্রান্ত কোন আলোচনা যেখানে হতো, তিনি সেখানে আগ্রহ সহকারে যেতেন। এই সময় সাঁত্রাগাছির রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ হয়। যোগমায়ার বয়স তখন মাত্র ছ'বছর।

বেদান্ত চর্চা করতে করতে প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর আস্থা ক্রমশঃ কমতে লাগলো। তখন ব্রাহ্মসমাজ সাধক সমাজের একটি গোষ্ঠী। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ব্রাহ্ম সমাজে বেদ ও উপনিষদ পাঠ নিয়মিত হতো। বহুলোক এইসব ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে যেতেন। বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্ম ধর্মের আস্বাদন গ্রহণ করতে নিয়মিত-ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। ক্রমে তিনি বৈদান্তিক হয়ে গেলেন। যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রত্যহ পূজা না করে জলগ্রহণ করতেন না, তিনিই এখন অদ্বৈতবাদের অহং ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করে পূজা অর্চনার আবশ্যিকতা অস্বীকার করতে আরম্ভ করলেন। এর উপর কৌলিক ব্যবসা গুরুগিরির উপরেও তিনি খুব বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন, এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একবার তিনি এক শিষ্যের বাড়ী যান। সেই পরিবারের এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর পাদপূজা করে বিনয়ীভাবে বললেন : প্রভু, আমি অকুল ভবসাগরে নিমগ্ন হয়ে কেবল হাবুডুবু খাচ্ছি, কিছুতেই উদ্ধার হতে পারছি না। আপনি আমায় উদ্ধার করুন।

মহিলার কাতরোক্তি শুনে বিজয়কৃষ্ণ ভাবলেন : সরলপ্রাণা এই মহিলার ধারণা, গুরুর বুঝি ত্রাণ করবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু আমার কি শক্তি আছে? আমি নিজে কিভাবে উদ্ধার হবো তার ঠিক নেই, আর আমি কিনা অপরকে পরিত্রাণ করবো? গুরুগিরি তখন তাঁর কাছে কপটতা ও পয়সা রোজগারের একটা ফিকির বলে মনে হতে লাগলো। এই সব সংশয়াত্মক প্রশ্ন উদিত হবার পর তিনি ভয়ানক মানসিক অশান্তি ভোগ করতে লাগলেন এবং শেষে গুরুগিরি মানে লোকের সরল বিশ্বাসের সুযোগে অর্থোপার্জন করা ভেবে কৌলিক গুরুগিরি করা তিনি একেবারে ছেড়ে দিলেন।

গুরুব্যবসা ছেড়ে দেওয়ায় তিনি খুব অর্থকষ্টে পড়লেন। সেই সময় তিনি প্রাণে শান্তির আশায় একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেন। ব্রাহ্মসমাজের পোষণকর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন উপাসনা করছিলেন। তাঁর প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও উপদেশ বিজয়-কৃষ্ণের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো এবং বলাবাহুল্য প্রতিমাপূজা-মূলক ধর্মে আস্থা তাঁর একেবারে চলে গেলো ও তিনি মহর্ষির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। ব্রাহ্মরা তখন উপবীত ধারণ করতেন, দেবেন্দ্রনাথেরও উপবীত ছিল। তিনি কিন্তু উপবীত ধারণে জাতিভেদ সমর্থন করা হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে উপবীত ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন যে উপবীত হচ্ছে জাতিভেদের প্রতীক, তাই উপবীত ধারণ তাঁর কাছে অসহনীয়।

উপবীত ত্যাগ করার জন্য বিজয়কৃষ্ণের উপর নানারকম অত্যাচার হয়। ব্রাহ্ম ও হিন্দুরা একযোগে তিনি সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন বলে তাঁকে উৎপীড়ন করতে থাকেন। তাঁর বড়দা ব্রজগোপাল গোস্বামী পর্যন্ত সমাজপতিদের কথায় প্রকাশ্য সভা করে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নিন্দা, কুৎসা, গালাগালি এমন কি প্রহার পর্যন্ত তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করতে লাগলেন। 'আমি সত্যভ্রষ্ট হইনি' এই দৃঢ় ও গভীর বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি হাসিমুখে সব রকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করেন।

কৌলিক গুরুব্যবসা ত্যাগ করে ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের আশায় তিনি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধ্যয়নের শেষ বর্ষে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের বিবাদ হওয়ায় তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। পরে অবশ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং সব ছাত্রই আবার কলেজে ফিরে যান। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ আর ফিরলেন না। তিনি দীনদুঃখীদের সেবা করার জন্য ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে চিকিৎসা ব্যবসায় মন দিলেন। ঢাকায় থাকার সময় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম তিনি প্রচার করেন। সে সময় তাঁর অদম্য উৎসাহ, ঈশ্বর লাভের জন্য আকুল আর্তি, সবরকম কুসংস্কার বর্জন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সকল সম্প্রদায়ের বিস্ময় ও প্রশংসার বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি ১২৭০ সালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বৃত হন এবং তাঁর সাহচর্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে ব্রাহ্মগণ নৈতিক উন্নতিসাধনে সমর্থ হন। সে সময় তাঁর প্রচারে ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থগন সপরিবারে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। হিন্দু সমাজপতিগণ তাঁর ধর্ম প্রচারে ও প্রভাবে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে হিন্দুধর্ম রক্ষাকল্পে তখন 'হিন্দু হিতৈষিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ যে সময় ঢাকায় ছিলেন, সেই সময় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত থেকে ফিরে আসেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের স্বতন্ত্র আকার দিয়ে সমাজ গঠন করতে আরম্ভ করেছেন। ব্রাহ্মগণের যাতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সৌহার্দ্য জন্মে, তার জন্য কেশবচন্দ্র ভারত আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম পরিবার হিন্দু পরিবারের মতন

DO NOT COPY

একান্নবর্তী পরিবার হিসাবে বাস করতেন। কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে এখন যেখানে সিটি কলেজের মীর্জাপুর স্ট্রীট ব্রাঞ্চ অবস্থিত, ঠিক সেখানে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেশবচন্দ্র নূতন আকারে ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি করেছেন শুনে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা ছেড়ে সপরিবারে ভারত আশ্রমে এসে বাস করতে লাগলেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রেমের যোগ ছিল এবং তাঁরা দুজন একত্রে ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের অনেক কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করেন। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি বিজয়কৃষ্ণের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধাবশতঃ সাধুসন্ন্যাসীদের দেখা পেলে তিনি যেন তাঁর হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছেন বলে মনে হতো। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনার ফলে তাঁর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি যোগসাধনা শুরু করেন। যোগসাধন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত তাঁর একখানি পুস্তকে এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অনেক নূতন জিনিষ জানতে পারবেন। কেশবচন্দ্রও সেইসময় যোগসাধনা করতেন। কেশবচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে 'যোগের সঞ্চার' বলে যে প্রার্থনা করেন, তাতে তিনি বলেনঃ "ভক্তিকে স্থায়ী করবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তা চিরকাল থাকবে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া আবশ্যক।-- যোগ কিছু শক্ত, মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝাও শক্ত; আজ পর্যন্ত ইহাকে দুর্লভ বলা যায়। যাঁহারা এই দুর্লভ যোগ পেয়েছেন তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের হইলে আর দশজনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়েনা। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় দুই পাঁচটি যোগীর দৃষ্টান্ত দেখা যায় – ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে, যোগ ভক্তিকে শ্রদ্ধাযুক্ত করে। একটি ভাই, আর একটি ভগিনী। একজন পরিচর্যা করে ভক্তিকে বিশ্বাস ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলো, আর একজন পরিচারিকা হয়ে যোগকে সরস করলো।– যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হবে না; আকাশ আর আকাশ থাকবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাবে। সর্বত্র এক জ্ঞান ঝকঝক করছে, এক শক্তি টনটন করছে – ইহা অনুভব হবে।" -- (জীবনবেদ)

এরপর বারদীর মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হবার পর বিজয়-কৃষ্ণের মনের গতি আর একটি পথে ধাবিত হয়। তিনি তাঁর বাড়ির বাইরে একটি আমগাছের তলায় আসন প্রস্তুত করে দিনরাত হরিনাম জপ ও হরি সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম সঙ্কীর্তন তাঁর জন্যই কেশবচন্দ্র প্রবর্তন করেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও যাতায়াত করতেন এবং পরে ভারতবর্ষের হিন্দুতীর্থগুলি প্রায় সব পরিভ্রমণ করেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তাঁর ভাবানুরাগ দেখে বৈষ্ণবগণ তাঁর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের একটি প্রধান উক্তি হচ্ছে : নামই ঔষধ। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্পসময়ের জন্যও সাধন করা কর্তব্য। ভাল না লাগলেও ঔষধ গেলার মতন করলে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হলে, তার ঔষধ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হয়, তখন মিশ্রিও তিক্ত লাগে। ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি। খেতে খেতে মিশ্রি মিষ্টি লাগতে থাকে।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রাণ মন ঢেলে দিলেন, ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবপ্রণালীর কীর্তন ও সঙ্কীর্তন প্রবর্তনে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে শেষে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হলে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন। বাঙ্গলা দেশের ও বিহারের বহু জায়গায় তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যোগসাধনে দীক্ষা দেওয়া ও মন্ত্র দ্বারা শিষ্য গ্রহণও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের বিরোধী বলে ব্রাহ্মরা তার প্রতিবাদ করেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে বিজয়কৃষ্ণের স্ত্রী বিয়োগ হয়; তিনি স্ত্রীর

দেহাবশিষ্ট অস্থি ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সমাধিস্থ করেন, সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় তিনি কলিকাতা ও ঢাকার শিষ্যদের ধর্মসাধন করার জন্য উপদেশ ও দীক্ষা প্রদান করতেন। তিনি কীর্তন করতে করতে এরূপ মাতোয়ারা হতেন যে, তাঁর প্রাণস্পর্শী উদ্দীপনাময়ী কীর্তন শুনে পাষাণ প্রাণও দ্রবীভূত হতো এবং তিনিও ভাবোন্মাদে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতেন।

সাধু বিজয়কৃষ্ণের জীবনে অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর জীবনীগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। স্বল্প পরিসরে তাঁর অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা অসম্ভব। দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কানা, খোঁড়া কখনও তাঁর সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়নি। ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে তিনি বৃন্দাবন থেকে যখন কলকাতায় আসেন, তখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে আসতেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎযোগ ছিন্ন করলেও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তিনি কখনও কোন কথা বলেন নি। তিনি বলতেন যে, ধর্ম-অধর্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে হয়। মনুষ্য সমাজ যে পাপ-পুণ্য স্থির করেছে, ভগবান তা দিয়ে বিচার করেন না। তিনি মানুষের হৃদয় দেখে বিচার করেন।

১৩০৪ সালের ২৪ শে ফাল্গুন বিজয়কৃষ্ণ পুরী যাত্রা করেন। সেখানে গিয়েও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি পুরীতে প্রচলিত অনেক সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে প্রয়াস পান। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বানর বধ। তাঁর অগণিত শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁকে ভক্তিবশতঃ যা দিতেন, তিনি সমস্ত প্রার্থীদের দিয়ে দিতেন। ধর্মসাধনের জন্য তাঁর কঠোর পরিশ্রম যথা অধ্যয়ন, কীর্তন, পাঠশ্রবণ, আলাপপ্রসঙ্গ, সাধন, জীবসেবা প্রভৃতি কাজ ঘড়ি ধরে তিনি করতেন। তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়, সৌম্যমূর্তি, সাধুসন্তদের উপর শ্রদ্ধা, নামকীর্তনে অদম্য উল্লাস, সর্বজীবে প্রেম প্রদর্শন প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনোচিত সকল গুণ দেখে কোন কোন তথাকথিত সাধু তাঁর যশঃসৌরভে ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রসাদের সঙ্গে বিষ দিয়ে ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তাঁর প্রাণ সংহার করে। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ নীলাচলে তাঁর শিষ্যবর্গ কর্তৃক নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরে অবস্থিত উদ্যানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে তাঁর মর্যাদাচিত একটি সমাধি মন্দির সেখানে নির্মিত হয়েছে। ইহা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ বলে কথিত এবং পুরীযাত্রী মাত্রেই সেখানে গিয়ে তাদের প্রণাম তাঁকে আজো জানান। আমিও সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে পেরে আজ কৃতার্থ হলাম।

DO NOT COPY